আবদেলওয়াহাব এম. এলমেসিরি

ভৌত বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে
জ্ঞানতত্ত্বীয় পক্ষপাত

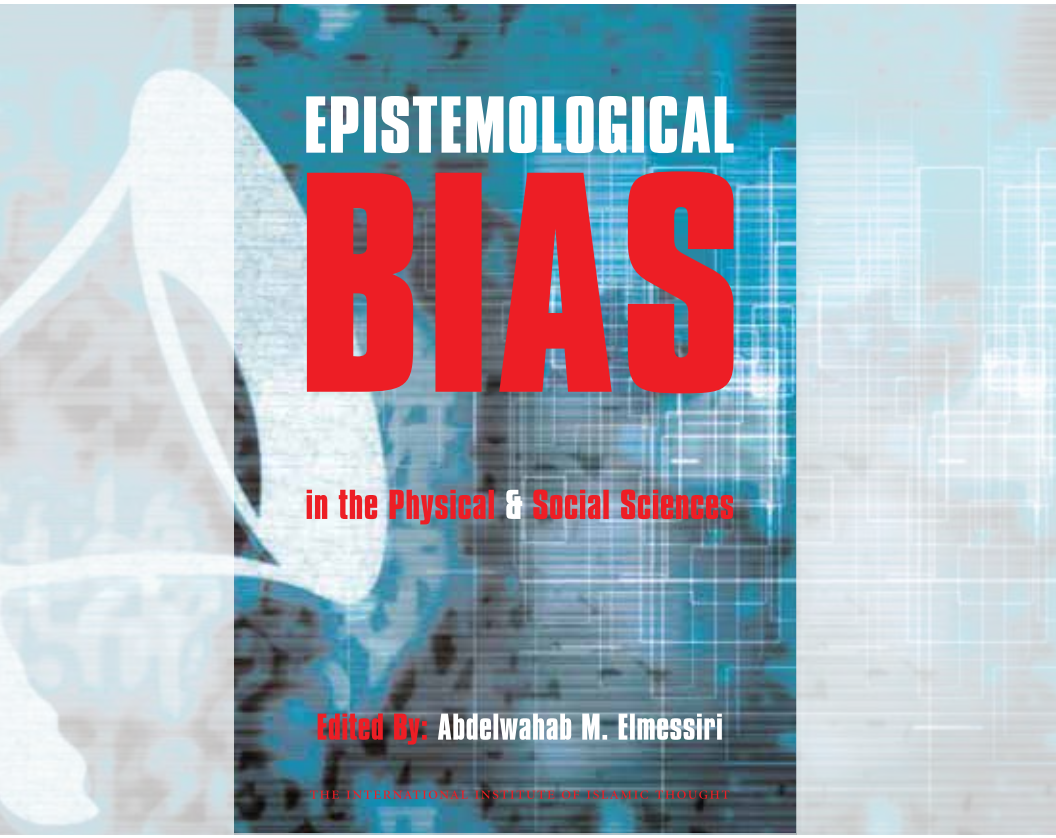

ভৌত বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে

জ্ঞানতত্ত্বীয় পক্ষপাত

সম্পাদনা (ইংরেজি)
আবদেলওয়াহাব এম. এলমেসিরি

সংক্ষেপণ
এলিসন লেক

বাংলা অনুবাদ
রওশন জান্নাত

সম্পাদনা
ড. এম আবদুল আজিজ

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ভৌত বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে জ্ঞানতত্ত্বীয় পক্ষপাত

সম্পাদনা (ইংরেজি): আবদেলওয়াহাব এম. এলমেসিরি

অনুবাদস্বত্ব
বিআইআইটি

প্রকাশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (৩য় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩৯৪৯, ০১৪০০ ৪০৩৯৫৮

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মূল্য
১২৫.০০ টাকা

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৬৭৩১-৮-৭

Bengali version of *'Epistemological Bias in the Physical and Social Sciences'*. published by BIIT Publications; 302, Books and Computer Complex Market (2nd Floor), 38/3, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh, E-mail: biitpublications@gmail.com; publication: September 2023, Price: Tk 125.00

আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজ

IIIT Books In Brief series আইআইআইটি'র মূল গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্তরূপে ধারাবাহিক প্রকাশনা। মূল্যবান এই সংগ্রহ পাঠকদের প্রকৃত গ্রন্থসমূহের মূলভাব বুঝতে সহায়তা করবে। সচেতনতার সাথে লিখিত হয়েছে মূলগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত, সহজপাঠ্য ও সময়-সাশ্রয়ী সংস্করণগুলো। আশা করা হচ্ছে এ সিরিজ অধিকতর জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে মূল গ্রন্থের অনুসন্ধানে পাঠকদের উৎসাহিত করবে।

ভৌত বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে জ্ঞানতত্ত্বীয় পক্ষপাত (Epistemological Bias in the Physical and Social Sciences) গ্রন্থটি এলমেসিরি কর্তৃক সম্পাদিত। পক্ষপাত বিষয়ক প্রবন্ধের এই সঙ্কলনটি আইআইআইটি কর্তৃক আরবিতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ সঙ্কলনের রচনাসমূহ এমন একটি প্রসঙ্গ নিয়ে অনুসন্ধান ও সমালোচনা করেছে যা পাশ্চাত্য দর্শন হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম অ্যাকাডেমিক জ্ঞানজগতে অপরিহার্য, সুসংজ্ঞায়িত এবং ব্যাপকভাবে গৃহীত। এটি হচ্ছে ইতিবাচকতা বা প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) আধিপত্য এবং মুসলিম সমাজ-অর্থনীতি-ধর্মীয় বাস্তবতার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ গবেষণা ধারা, পদ্ধতি, নমুনা, পারিভাষিক শব্দাবলি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করে নেয়া বা সংস্কৃতির সাথে প্রায় একীভূত করা। তাহলে তাদের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? এলমেসিরি'র মতে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সবদিকের গবেষকগণই বিভিন্ন পদ্ধতি ও পারিভাষিক শব্দাবলি সংক্রান্ত বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছেন। অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের স্কলারগণ গভীরভাবে এ-সমস্যার সম্মুখীন হন। কারণ, যদিও তাঁরা তাঁদের সুনির্দিষ্ট ধারণা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিবেশের ভিতরে থেকে লেখেন তা সত্ত্বেও ভিনদেশি প্রভাবের মুখোমুখি হন। এটি তৃতীয়বিশ্বের সমাজ, মানুষের কল্পনা ও চিন্তায় আরোপিত হয়। কেন আমরা একটি নতুন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করি না যা এর নিজস্ব কার্যসাধন পদ্ধতি, গবেষণা পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে আদর্শগতভাবে

উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হবে; এর মাধ্যমে জ্ঞানতাত্ত্বিক পক্ষপাতের মোকাবিলা হবে এবং ইজতিহাদের দরজা খুলে যাবে?

এ-সঙ্কলনের রচনাসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের পারিভাষিক শব্দাবলি, পদ্ধতিসমূহ, গবেষণা উপকরণ এবং ধারণাগত মূলনীতিসমূহের মাঝের সুপ্ত পক্ষপাতগুলো খুঁজে বের করা ও পক্ষপাতগুলোর নিরপেক্ষ বিকল্প উপস্থাপন করা। এটি পশ্চিমা সৃজনশীল অবদানের মানবিক মূল্যবোধকে খাটো করে দেখা নয়; বরং একেই একমাত্র অবলম্বন মনে করে সর্বদা 'আঁকড়ে ধরে' থাকার চেষ্টার ভয়াবহতা তুলে ধরা।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

ভৌত বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে জ্ঞানতত্ত্বীয় পক্ষপাত
সম্পাদনা : আবদেলওয়াহাব এম. এলমেসিরি

সূচি

সূচনা ॥ ৭

প্রথম অধ্যায়

ইজতিহাদের দ্বার : জ্ঞানতাত্ত্বিক পক্ষপাত অধ্যয়নের একটি সূচনা ॥ ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্য চিন্তন-প্রক্রিয়ায় পক্ষপাত : উন্নয়নের সূচনাবিন্দু হিসেবে
আমাদের ঐতিহ্য ॥ ১৩

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পক্ষপাতপূর্ণ নিবন্ধের উদাহরণ ॥ ১৬

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজবিজ্ঞানের আধুনিকীকরণ বনাম পশ্চিমাকরণ
মনোবিজ্ঞান যখন বিবেচ্য ॥ ১৯

পঞ্চম অধ্যায়

কারিকুলামে পক্ষপাত ॥ ২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রকৃতির উন্মোচন
কুরআনসম্মত প্রেক্ষাপট ॥ ২৪

সপ্তম অধ্যায়

তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতিতে পক্ষপাতের মোকাবিলা করা ॥ ২৭

অষ্টম অধ্যায়

পদ্ধতিবিদ্যার সীমা অতিক্রম
পাশ্চাত্যের সাহিত্য সমালোচনায় পক্ষপাত ॥ ৩০

নবম অধ্যায়
ইসলামী সমাজের স্থাপত্যশৈলীতে
নকশার তত্ত্ব ও মূলনীতি: সম্প্রদায় নির্মাণের জন্য
একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ॥ ৩৩

দশম অধ্যায়
প্রযুক্তি ও উন্নয়নের প্রতিফলন
একটি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ ॥ ৩৫

একাদশ অধ্যায়
ভৌতবিজ্ঞান আইন প্রণয়নের অন্তর্নিহিত দার্শনিক বিশ্বাস ॥ ৩৮

সূচনা

মুসলিম বিশ্বের আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় বাস্তবতার উদাহরণ বা নমুনা (paradims), পরিভাষা (terminologies) ও গবেষণার মডেলগুলোর ক্ষেত্রে বহিরাগতদের ব্যাপক গ্রহণ এবং গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে এ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অবহেলিত অ্যাকাডেমিক ইস্যুটির সন্ধান করেছে। গবেষকগণ সর্বত্রই পদ্ধতি বিজ্ঞান এবং পরিভাষার পক্ষপাতের সম্মুখীন হন কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের স্কলারদের মাঝে এ সমস্যা বিশেষভাবে প্রকট। তারা যদিও তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন তা সত্ত্বেও তাদেরকে সমাজ ও চিন্তা প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী ভিনদেশীয় বা পাশ্চাত্য ধারার মুখোমুখি হতে হয়।

পাশ্চাত্যের প্যারাডাইম তাদের নিজস্ব অর্থনীতি ও রাজনীতির জন্য সুবিধাজনক, কিন্তু পশ্চিমা ভিন্ন অন্য কোনো জাতির জন্য এটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় বিভ্রান্তিকর ফল নিয়ে আসে। স্কলারগণ তাদের নিজস্ব প্যারাডাইম পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য প্যারাডাইম গ্রহণ ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা শুরু করে, যদিও এটি ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে। কোনো সম্প্রদায় যদি প্রভাব বা ফলাফল সংক্রান্ত জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তাদের সংস্কৃতির সাথে বৈপরীতপূর্ণ বহিরাগত প্যারাডাইম এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, তখন এর ফলশ্রুতিতে হুমকির সম্মুখীন হয়।

আরব জাতিসত্তার চেতনা উন্মেষের ফলে তাদের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট পরিচিতি সৃষ্টির দাবি জোরদার হয়। কিন্তু এতে কোনো সমন্বিত ও পদ্ধতিগত উদ্যোগ ছিল না। বর্তমান আরব সামাজিক বিজ্ঞানে বিদ্যমান নিরপেক্ষহীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন একটি নতুন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা। এ নতুন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা হতে হবে নিজস্ব কার্যসাধন পদ্ধতি, গবেষণা পদ্ধতি এবং কার্যপরিধির অধীন, যা জ্ঞানীয় বৈষম্য দূর করে ইজতিহাদ বা বিশদ ব্যাখ্যার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে।

পক্ষপাত হচ্ছে একটি প্যারাডাইমের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ এবং গবেষককে দিকনির্দেশনা প্রদানকারী কার্যপদ্ধতিসমূহের সংমিশ্রণ। এ মূল্যবোধসমূহ কখনও থাকে অনুকরণীয় আদর্শ, নমুনা বা ধারণাগত রূপক হিসেবে, কখনও গবেষণা পদ্ধতিসমূহের সাথে সংযুক্ত এবং পৃথক করা খুবই দুঃসাধ্য।

বহু জ্ঞানতত্ত্বীয় অন্তর্নিহিত রূপকসমূহ পক্ষপাতিত্বপূর্ণভাবে সরাসরি পাশ্চাত্য থেকে এসেছে এবং চিন্তা ও গবেষণার স্বাধীনতাকে সীমিত করেছে। জ্ঞানীয় বৈষম্যসমূহকে সচেতনতার সাথে সুনির্দিষ্ট করে আমরা একটি বিকল্প প্যারাডাইম সৃষ্টি করতে পারি। এ বিতর্কিত বিষয়টিই এ গ্রন্থের কেসস্টাডিতে উপস্থাপিত হয়েছে এবং নির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রের অন্তর্নিহিত পক্ষপাতকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে উন্মোচিত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট উদাহরণ, ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রাচ্য গবেষণায় পক্ষপাত কীভাবে কাজ করছে এবং পক্ষপাতকে কীভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে এরূপ উদাহরণ। আরও দেখানো হয়েছে, একটি নতুন প্যারাডাইম কর্তৃক প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণা পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমেই এর সমাধান সম্ভব।

এ গবেষণায় গবেষকগণ তাদের নিজস্ব বৈষম্য বর্ণনা করেন এবং বিকল্প পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। এই বিকল্প প্যারাডাইম এমন নয় যে বিদ্যমান প্যারাডাইমকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করবে বরং মুসলিম সমাজ সংক্রান্ত গবেষণায় পূর্ণভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সংকীর্ণ পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ওপর নির্ভরশীল প্যারাডাইমকে রূপান্তর করে সর্বজনীন প্যারাডাইমের প্রবর্তন বিদ্যমান গবেষণা পদ্ধতিকে আরও সমৃদ্ধশালী করবে এবং এর কার্যপরিধি ব্যাপক হবে। একটি স্বাধীন মুসলিম প্যারাডাইম কখনই পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না। নতুন প্যারাডাইম বিদ্যমান প্যারাডাইমের কার্যপরিধি বৃদ্ধি করবে; চিন্তা-ধারণার অগ্রগতি ঘটাবে। আরব গবেষকদের পশ্চিমা পক্ষপাতদুষ্ট পদ্ধতি ও টুলস ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও জটিল এবং বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি তৈরি করা যেতে পারে এবং সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

এ গ্রন্থটিতে পক্ষপাতকে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃজনশীলতার সাথে যাচাই এবং এর থেকে কীভাবে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব সে সম্পর্কিত ধারণা প্রদান প্রসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আশা করা যায়, পক্ষপাত-বিজ্ঞান (ফিকহ) ধ্বংস, বিমূর্ত, সাধারণীকরণ ও অমানবিকতাকে প্রতিহত করে মানব সম্প্রদায়কে সুনির্দিষ্ট, বিশেষায়িত ও যথাযথ মানবিকতা বজায় রাখায় সহায়তা করবে।

প্রথম অধ্যায়

ইজতিহাদের দ্বার
জ্ঞানতাত্ত্বিক পক্ষপাত অধ্যয়নের একটি সূচনা

আবদেলওয়াহাব এলমেসিরি

মানুষের আচার-আচরণ, ব্যবহার, কাজ, শারীরিক প্রকাশভঙ্গি, ঘটনা এবং হাজারও অবধারিত কার্যক্রম নিয়েই মানবজীবন গঠিত। মানুষের অনিচ্ছাকৃত (involuntary) ক্রিয়া, যেমন– শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যতীত অন্যান্য সকল কার্যক্রম সচেতন বা অসচেতন মনের গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ এবং ব্যক্তির সাংস্কৃতিক চিন্তা-ধারণার প্রতিফলন। সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষেও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, মনের দিক থেকে পরাজয় ঘটলে সবকিছুতেই পতনের চিহ্ন বা লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। অন্যদিকে, একই ঘটনা বা বস্তুতেও অভ্যন্তরীণ জয় বা মনের জয়ের ফলে সাফল্য বা বিজয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিটি মানুষের আচরণই সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছু জ্ঞানতত্ত্বীয় প্যারাডাইম ও অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে। একটি প্যারাডাইম হচ্ছে একটি মনের বিমূর্ত চিত্র, একটি কল্পিত কাঠামো এবং বাস্তবতার এক প্রতীকী প্রতিনিধিত্বকারী যা মানসিক পুনর্গঠন বা অ-পুনর্গঠনের ফল। মানুষের মন বাস্তবতার চিত্র বা বৈশিষ্ট্য থেকে কিছু গ্রহণ বা বর্জন করে, গুরুত্বের ক্রমানুসারে এবং বাস্তবে কাজে লাগানোর উপযোগী করে পুনর্বিন্যাস করে সেসব সন্নিবেশিত করে। প্যারাডাইম অনুযায়ী যেসব উপাদান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয় সেগুলোকেই অতিরঞ্জিত করা হয়। অন্যান্য উপাদানসমূহকে করা হয় অবহেলা। প্রতিটি প্যারাডাইমই এর স্বকীয় ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য, বিশ্বাস, অনুমান ও ফলাফলসহ জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে কোনো সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করা। এটি সুনির্দিষ্ট নির্বাচিত কিছু মানুষের মন ও চিন্তা-প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সংগঠনগত দিক বিবেচনায় পক্ষপাতিত্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং

সুনির্দিষ্ট ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ভাষাকে পক্ষপাতিত্বের একটি উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে। পক্ষপাতিত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়, মানুষের স্বকীয়তা এবং পছন্দের স্বাধীনতা থেকেই এর উদ্ভব। এর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানুষের ভাষা পক্ষপাতিত্বকে দূরীভূত করার জন্য এবং জ্ঞানতত্ত্বীয় প্যারাডাইম গঠনের জন্য সফল যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।

কিছু পক্ষপাতিত্ব উন্মুক্ত এবং সচেতন, অন্যদিকে অন্য পক্ষপাতিত্বসমূহ অসচেতনভাবে সৃষ্ট। অসচেতন পক্ষপাতিত্ব সংগঠিত হয় যখন কেউ জ্ঞানকে আত্মগত করে নেয় এবং এ সংকীর্ণতার মধ্য দিয়েই বিশ্বকে দেখে। পক্ষপাতিত্ব আরও অনেক রূপে আবির্ভূত হয় এবং সকলক্ষেত্রে এর প্রকাশ যৌক্তিক নয়।

পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক প্যারাডাইমের পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক বিস্তৃত পক্ষপাতিত্ব। আমাদের ঐতিহ্যকে যারা পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য প্যারাডাইমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তারা এ আচরণের ফলাফল অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি এবং তারা প্রতিটি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে কোনো সমালোচনামূলক ও সৃজনশীল গবেষণাও করেনি। ইসলামী বিশ্বের যারা প্রথম থেকেই এরূপ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরোধিতা করছিল তারাও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। অধুনা, ইসলামী বিশ্বসহ 'তৃতীয় বিশ্বের' সকল তথাকথিত পুনরুভ্যুদয় প্রকল্পে পাশ্চাত্যের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার প্রেষণা কাজ করছে। এটি সর্বাধিক স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় ধর্মনিরপেক্ষ উদারপন্থী চিন্তন প্রক্রিয়ায়, যেখানে 'রেনেসাঁ' বলতে বুঝায় পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও তত্ত্বসহ পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক প্যারাডাইমকে গ্রহণ করে নেওয়া। সুতরাং আরব ও মুসলিম সমাজকে 'সংস্কারকৃত' হতে হলে পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক প্যারাডাইমকে অনুসরণ করতে হবে বলে ধরে নেওয়া হয়।

এ উদ্যোগের ফলে আরব বুদ্ধিজীবীরা এক পর্যায়ে নিজেদের ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যকে গ্রহণ করায় আগ্রহী হন। এ ধরনের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা বেশ ভয়াবহ, কারণ তারা পাশ্চাত্যের আদলে মূল্যবোধকে পুনর্নির্ধারণ করছে এবং পাশ্চাত্য প্যারাডাইমের প্রসার ঘটাচ্ছে। সাধারণত একটি সাংস্কৃতিক প্যারাডাইমের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ সম্বলিত একটি সম্পূর্ণ জ্ঞানগত প্যারাডাইম। আধুনিক পশ্চিমা প্যারাডাইম উপযোগবাদ ও যৌক্তিক-

বস্তুবাদের উদাহরণ এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও এর প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। এটি আরও প্রতীয়মান হয় মানুষের পরিভাষা, স্বতঃসিদ্ধ গবেষণা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালীতে। এ বস্তুবাদী প্যারাডাইম সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী কারণ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ তাদের নিজস্ব প্যারাডাইমকে আন্তর্জাতিকীকরণ করেছে এবং পশ্চিমা প্যারাডাইম সর্বজনীন– এরূপ ভুল ধারণা প্রচারের মাধ্যমে এটি অনেক সমাজে আরোপিত করেছে।

এ প্যারাডাইম একটি নিজস্বসৃষ্ট বিশ্ব সম্পর্কিত কেন্দ্রীভূত ধারণাভিত্তিক। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা, যুক্তি, বিশ্বাস, বর্ণনা শক্তির সীমার বাইরে কিছু ধারণা করতে সক্ষম নয়। দ্বিতীয়ত, একই আইন উভয়ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে মানব ও প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ একটি চলমান সমগ্রতা গঠন করে। এভাবে মানুষ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ দৃষ্টিভঙ্গি মানবীয় ও নিরবয়ব বিষয়সমূহের মূল্যে বস্তু ও প্রকৃতির প্রতি পক্ষপাতিত্বের সৃষ্টি করে। একইভাবে অপ্রত্যক্ষ, গুণবাচক ও পরিমাপ করা যায় না এরূপ বিষয়সমূহের মূল্যে প্রত্যক্ষ, পরিমাপযোগ্য এবং পরিমাণবাচক বিষয়সমূহের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়। পাশ্চাত্য সমাজকে বিবেচনা করা হয় বিশ্বজনীন, বিবর্তনমূলক, একরৈখিক এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার শীর্ষে; সুতরাং অনুকরণীয় আদর্শ। যাই হোক, এ ধরনের অনুমান অকার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এখন এটিই উন্মোচিত হয়েছে যে, প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত এবং মানুষের জ্ঞানের পরিধিও সীমাবদ্ধ।

কিছু কার্যকর পদক্ষেপ আমাদেরকে এরূপ পক্ষপাতিত্ব কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে। প্রথম পদক্ষেপ হবে এটি জানা যে, পক্ষপাতিত্ব অনিবার্য। আমাদের পক্ষপাতিত্ব আবিষ্কারের তাত্ত্বিক প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য দর্শনের সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামোকে অবশ্যই অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। শুধু একটি ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক দর্শনে জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকবে এরূপ ধারণা পরিত্যাগ করে একটি অধিক প্রগতিশীল, সমন্বিত ও সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার ক্ষেত্রেও আমাদের আন্তরিক হতে হবে যেন আমরা তাদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য থেকে জ্ঞান অর্জন করে মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত আমাদের বোধগম্যতাকে গভীর করতে পারি। আমাদের পক্ষপাতিত্বকে দূরীভূত করে একটি বিকল্প প্যারাডাইম গঠন করা উচিত যা পূর্ববর্তী মানব অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ হবে, পশ্চিমা অভিজ্ঞতাকে পরিত্যাগ করে নয়।

একটি প্রস্তাবিত বিকল্প প্যারাডাইম এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আমাদের নিজস্ব ইসলামী ঐতিহ্য থেকেই গঠিত হবে; এ মহাবিশ্বে মানুষ কেন্দ্রীয় অবস্থান দখল করে আছে– এ জ্ঞান নিয়ে যাত্রা শুরু করে একটি সমন্বিত তত্ত্বের নিমিত্তে কাজ করবে; শুধু বস্তুবাদ উপাদানভিত্তিক হবে না। এ প্যারাডাইম ক্রমবর্ধনশীল না হয়ে বরং উৎপাদনশীল পদ্ধতিতে কাজ করবে এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞান সুনিশ্চিত– এই ধারণা পরিত্যাগ করে অবিচ্ছিন্ন ইজতিহাদের পথ খোলা রাখতে হবে। ■

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্য চিন্তন-প্রক্রিয়ায় পক্ষপাত উন্নয়নের সূচনাবিন্দু হিসেবে আমাদের ঐতিহ্য

আদেল হুসাইন

আরব ও মুসলিম বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক পর্যায়ে আমাদের গতানুগতিক ধারণা ও অবস্থানের সমালোচনামূলক পুনর্বিবেচনার একটি অবস্থানে প্রবেশ করেছে। সমাজবিজ্ঞান অনেকদিন সংরক্ষিত তত্ত্বের ওপর নির্ভর করায় আমাদের বিজ্ঞানীদেরকে তাদের নিজস্ব সমালোচনামূলক কাজের চর্চা থেকে দূরে রেখেছে। জ্ঞানীয় বিবেচনায়, আলোকিতকরণ ধারণা বলতে বুঝায় 'ইহজাগতিক' যা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিদ্যমান। পাশ্চাত্য সামাজিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিল সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে একীভূত করা এবং আমরাও একই পদ্ধতি গ্রহণ করে নিয়েছি। তা সত্ত্বেও সামাজিক বিজ্ঞানের পক্ষপাতিত্বহীন, সর্বজনীন, বিশ্বস্ত, বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক আইনসম্মত পরিচিতির জন্য প্রয়োজন মানবসমাজ ও এর ইতিহাস সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানের ভিত্তি।

সামাজিক বিজ্ঞানের সীমিত পশ্চিমা পরিসরে তাত্ত্বিক নমুনাসমূহ ব্যাপকভাবে শ্রম ও মূলধনের সংঘাত, পার্থিব ধারণা এবং বস্তুগত অগ্রগতির ধারণাতে কেন্দ্রীভূত। প্রকৃতপক্ষে, সমসাময়িক পাশ্চাত্য সভ্যতা যে সমস্যা ও দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হচ্ছে তার সমাধান পাশ্চাত্য সভ্যতার সমাজ ও অর্থনীতি থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, এ বিষয়টি এখনও পরিপূর্ণভাবে গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন। ওইসব পাশ্চাত্য বিষয়সমূহের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হই, এজন্য ভিন্ন চিন্তা ও গবেষণা পদ্ধতির প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

গত দুই শতক ধরে মানসম্মত যত গবেষণা প্রবন্ধ রচিত হয়েছে তা মূলত ইউরোপীয়, সরাসরি গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞান থেকে আগত। অর্থনৈতিক অবস্থা

বিশ্বের পরাশক্তি নির্ধারণ করে, যে পরাশক্তি অতঃপর আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজনের ওপর নির্ভরশীল হয়। পাশ্চাত্যের বাইরের সব ধরনের সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিকৃষ্ট বলে গণ্য এবং উন্নয়নের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। এ মতবাদ সাম্রাজ্যবাদের যৌক্তিকতা প্রদান করে এবং পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদকে সর্বাপেক্ষা মন্দরূপ প্রদান করে।

আমাদের প্রাচ্য সমাজের স্বাধীন সামাজিকবিজ্ঞান চর্চাকারীগণ পাশ্চাত্য তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীলতার ব্যাপারে সচেতন হচ্ছেন। এ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আরও দৃঢ় হয় আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে পাশ্চাত্য গবেষণায় পক্ষপাতিত্ব, অধিকার ক্ষুণ্ন করা এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়াই মতামত প্রদান করার মতো কার্যক্রমকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে। বহু বাস্তব-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গবেষণা আমাদের অর্জনের প্রকৃত মূল্যকে প্রদর্শন করে এবং আমাদের নিজস্ব ইতিহাসের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারা বা মতবাদ নিশ্চিত করে যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে বৈশ্বিক (ইহজাগতিক বা পার্থিব) এবং নিজস্ব শারীরিক আগ্রহকেই সবকিছুর ওপর প্রাধান্য প্রদান করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষের বস্তুগত নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শিল্প এবং প্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় আমরা কিছু পাশ্চাত্য তত্ত্বকে পরিত্যাগ করে নয় বরং অবশ্যই যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করবো– কোনটি পশ্চিমা, কোনটি বিশ্বজনীন এবং কোনটি আমাদের নিজস্ব মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ। এরূপ বহু ধারণা (যেমন– ইহজাগতিক বা ধর্মনিরপেক্ষতা) আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। আমাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব এবং চূড়ান্ত তথ্যনির্দেশ বা সূত্র প্রধানত আসে ইসলাম থেকে। ইসলামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রভাবে ভবিষ্যৎ গঠন করা স্বাধীন তাত্ত্বিক অথবা সমসাময়িক ফিকহ ও ইজতিহাদের দায়িত্ব।

উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য প্রভাবশালী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে। এ লক্ষ্যকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে তা হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক আমূল সংস্কার। এর সাথে মিল রেখেই উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করতে হবে।

স্বাধীনতার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সাথে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের কৌশল হিসেবে প্রয়োজন ছয়টি মূলনীতির সমন্বয় : বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক;

আত্মবিশ্বাস বা স্বনির্ভরতা; স্বাধীনতা রক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা; অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তি বৃদ্ধিকরণের কৌশল; বণ্টন এবং সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া। স্বাধীনভাবে উন্নয়নকে বুঝতে হবে সামাজিক ক্রিয়ার ধারণার মাধ্যমে যা একটি নির্দিষ্ট সমাজ-জাতির অধীন যথাযথ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একাধিক প্রতিযোগিতামূলক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণত মহৎ বিপ্লব সংগঠনের প্রেরণা আসে একটি দৃঢ় মতবাদ থেকে; এবং ইসলাম সুনির্দিষ্টভাবে এরূপ মতবাদ ধারণ করে। স্বাধীনভাবে উন্নয়নের মডেল পরাশক্তির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনীতির সাথে অনবরত বিরোধিতা প্রদর্শন করে; কিন্তু তা আমাদের নিজস্বতাবিরোধী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেষ্টাকে খুব কমই ধারণ করে। ■

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পক্ষপাতপূর্ণ নিবন্ধের উদাহরণ

নসর এম. আরিফ

যেকোনো শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান সম্পর্কিত কাজ ওই সমাজের সংস্কৃতিকেই প্রকাশ করে যা দ্বারা লেখকের চিন্তাধারা গড়ে ওঠে এবং অবহিত হওয়া যায়। ফলে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা অর্জন সম্ভব হয় না। জ্ঞান সময় ও স্থান দ্বারা প্রভাবিত। পক্ষপাতিত্ব এবং নিজের বৈশিষ্ট্য দিয়ে অন্যকে মূল্যায়ন করার মূলে রয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতা। রাজনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বকে উন্নয়নের ধারণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে ধরে নেয়া হয়। এ তত্ত্বেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব উন্নয়নের তত্ত্ব কেন্দ্রীভূত হয়। আলোচ্য বিশ্লেষণে উন্নয়নতত্ত্বের পদ্ধতিগত ও দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কিত ধারণা প্রদান করা হবে। রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণা এবং এর মূল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে পক্ষপাতিত্ব এ তত্ত্বসমূহকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে প্রভাবিত করেছে কিনা অথবা এই তত্ত্বসমূহ সর্বজনীন কিনা যা তাদের মাঝের ভিন্নতা সত্ত্বেও সব সমাজেই প্রয়োগযোগ্য।

বিজ্ঞান মানুষ অথবা প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ নিয়ে গবেষণা করে এসব বিষয়ের বিস্তারিত অথবা ভৌগোলিক অবস্থানের বিবেচনা ছাড়াই। পাশ্চাত্য ভাবনা অনুযায়ী বিজ্ঞান হচ্ছে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম যা বস্তুর প্রকৃত এবং বস্তুনিষ্ঠ অবস্থা নিয়ে গবেষণা করে। পাশ্চাত্যের সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও উন্নয়নের গভীর অনুসন্ধানে পরিলক্ষিত হয়, মানুষের বাস্তবতা সংক্রান্ত বোধগম্যতা এবং নিয়ন্ত্রণে তাদের পদ্ধতিকে তারা সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করে। রেনেসাঁর সময় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক একটি ধারা দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে অপশ্চিমা সমাজগুলোকে কেন্দ্র করে। এরূপ গবেষণা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও ত্রুটিপূর্ণ এবং পাশ্চাত্য সমাজ

বিজ্ঞান উপকরণ, গবেষণা পদ্ধতি এবং নিবন্ধের উন্নয়ন সত্ত্বেও তাতে সৃজনশীলতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

পাশ্চাত্য ভিন্ন অন্যান্য সমাজকে নিয়ে গবেষণায় নিয়োজিত পদ্ধতি এমনভাবে পরিকল্পিত যার লক্ষ্য পাশ্চাত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষী সভ্যতা থেকে প্রাচ্যের ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন করে প্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা। নৃবিজ্ঞান অপাশ্চাত্য বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ ও অবমূল্যায়ন করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাড়তি একটি অংশ হিসেবে প্রাচ্য সভ্যতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। প্রাচ্য বিষয়ক গবেষণার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সাথে পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রাচ্যবাদের উদ্ভব ঘটে তখনি যখন 'অন্যান্য' অর্থাৎ ইসলাম অথবা ধর্মীয় প্রাচ্যকে ইঙ্গিত করা হয়। উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে ভিন্ন একটি আধিপত্যের সূচনা হয় যা পাশ্চাত্যকে অন্যান্য সমাজের জন্য অনুসরণীয় মানবীয় ও সামাজিক মডেল হিসেবে তুলে ধরে। সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রতিষ্ঠান এসব সমাজকে পশ্চিমা গবেষণা পদ্ধতি অনুসারে অধ্যয়ন করতে পারবে না, বরং স্বাধীন বিশ্বাসযোগ্য গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেই এসব সমাজকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

পাশ্চাত্য সমাজ এমন একটি সাধারণীকৃত নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে যা মানবতাকে 'তাদের' এবং 'আমাদের' মাঝে বিভাজন করে। ফলে 'অন্যান্য' সমাজ কার্যকর বৈশিষ্ট্যহীন বা ভিত্তিহীন বলে অযৌক্তিকভাবে প্রচার লাভ করে। যারা এভাবে প্রাচ্যকে সংজ্ঞায়িত করে তারা বেশকিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে একটি গুরুতর ঝুঁকির পথ সৃষ্টি করে। এখানে 'অন্যান্য' সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে যেয়ে তাদেরকে পশ্চাৎপদ জাতি, সেকেলে, কৃষিজীবী, শিল্পায়নবিহীন ও তৃতীয় বিশ্ব বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এসব দেশ নিয়ে যখন গবেষণা করা হয় তখন খুব কমই দেখানো হয় এদের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক যোগসূত্র এবং পাশ্চাত্য কর্তৃক জোরপূর্বক 'অন্যান্যদের' এক ধরে সংজ্ঞায়িত করা হয় যদিও তাদের রয়েছে অভ্যন্তরীণ বহুমুখিতা বা বৈচিত্র্য।

প্রাচ্যবাদের অভ্যুদয়ের সময় থেকে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা অন্যদের ওপর আরোপ করেছেন ইতিহাসের শ্রেণি বিন্যাসকরণের মাধ্যমে। তারা ইতিহাসকে যেভাবে ভাগ করেছেন তা হচ্ছে প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। আরও যেসব কৌশল তারা অবলম্বন করেছিলেন তা হচ্ছে রাষ্ট্র সম্পর্কিত পশ্চিমা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণার প্রচার এবং পাশ্চাত্য আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে অন্যান্যদের ওপর আরোপিত করা। তাদের এ আত্মকেন্দ্রিকতার বৈষম্য অন্যদের অধিকার বঞ্চিত করে এবং একে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের কাঠামো থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা চালায়। পক্ষপাতপূর্ণ বিজ্ঞান তার নিজস্ব শ্রেণিবিন্যাস, ধারণা এবং পদ্ধতি অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়। যদি আমরা সাধারণভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলির সাহিত্য বিবেচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনীতিকে রহিত করে সেখানে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে আধুনিক সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতি।

পক্ষপাতিত্ব কখনও কখনও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার বিশ্লেষণ পদ্ধতি, ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি এবং গবেষণার সিদ্ধান্ত বা ফলাফলকেও নির্ধারণ করে। এর ফলে, নিরপেক্ষ গবেষকগণ কখনও বৈষম্যকে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন না, বরং তারা এর নিষ্ক্রিয়করণ অথবা এর প্রভাব দূর করেন। বৈষম্যের সংজ্ঞায়িতকরণ এবং নিরপেক্ষকরণ রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাসমূহের দু-ধরনের মৌলিক পদ্ধতি নিয়ে অবশ্যই গঠিত হবে। রাজনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বগুলো পক্ষপাতের সংকল্প পরিবর্তন এবং সামাজিক বিপ্লবের সারাংশ। এর জন্য প্রয়োজন পদ্ধতিবিজ্ঞানগত পদক্ষেপ।

যদি গবেষক এ পদক্ষেপসমূহ প্রয়োগ করেন পরবর্তী পদক্ষেপ হবে গবেষকের নিজের গবেষণায় পক্ষপাতিত্বকে নিরপেক্ষ করা। একটি মৌলিক বিষয় থাকে যা কেবল বিদ্বান এবং শিক্ষানবিশদের নৈতিকতা জানার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি হবে সততা, নৈতিকতা এবং সঠিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শ বৈশিষ্ট্যসমূহকে দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে অনুকরণ করা। ■

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজবিজ্ঞানের আধুনিকীকরণ বনাম পশ্চিমাকরণ মনোবিজ্ঞান যখন বিবেচ্য

রফিক হাবিব

সর্বত্র সম্প্রদায়সমূহ তাদের প্রযুক্তিগত কৃতিত্ব এবং বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের উন্নতি সাধন করার জন্য কাজ করে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ধারণা ও পদ্ধতিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অপেক্ষা কৃতিত্ব বা অর্জনকেই গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তৃতীয় বিশ্ব উন্নয়নের ধারা পরিমাপ করে উন্নত বিশ্বের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে গ্রহণ বা অনুকরণের মাপকাঠিতে। অগ্রসর জাতি কর্তৃক গৃহীত বৈজ্ঞানিক প্যারাডাইম আইনসম্মত ও গুরুত্ববহ। কেননা এটি ওই এলাকাবাসী কর্তৃক গ্রহণযোগ্যভাবে পরিবেশকে রূপান্তর করতে পারে। আরব বিশ্ব এবং অন্যত্র পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গ্রহণ করা হয় পশ্চিমাদের জীবনযাপন প্রণালী ও আদর্শসহ আমদানিকৃত প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যুক্তি উপস্থাপন করে। বিজ্ঞানকে জীবনের একটি লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক নয়; বরং পরিবেশকে রূপান্তরের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

অনুকরণ কখনও অর্জনের সমকক্ষ হতে পারে না। মুসলিম বিশ্ব আধুনিক বিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক এবং প্রায়োগিক বিষয়সমূহ গ্রহণে সমর্থ হলেও এর ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকা আত্মস্থ করতে সমর্থ হয়নি। অন্যদের অনুসরণ করার ফলে প্রকৃত অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। নতুন বৈজ্ঞানিক মডেল এবং জীবনাদর্শ গঠনের সামর্থ্যে মুসলিম সাংস্কৃতিক পরিচিতি প্রতিফলিত হয় ।

পাশ্চাত্য দর্শন এবং ধর্মতত্ত্বের প্রকৃত অগ্রগতি গতিশীলতাপ্রাপ্ত হয়নি যতক্ষণ না পশ্চিমা বিশ্ব আরব চিন্তন-প্রক্রিয়াকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। অপরদিকে, আরব বিশ্ব অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রতি ভীতি

কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অন্য সংস্কৃতির প্রতি এরূপ বিরূপ মনোভাব একে দূরে রাখে এবং অনুকরণের সময়টিও অকার্যকর হয়, বর্তমান পশ্চাৎপদ অবস্থাটিকে আরও জোরদার এবং দীর্ঘায়িত করা হয়। মুসলিম বিশ্ব বহু বহির্দেশীয় ধারণা ও মূল্যবোধকে দীর্ঘসময় যাবৎ স্বীকৃতি দিয়েছে, এভাবে তারা তাদের নিজস্ব পরিচিতিকে ক্ষুণ্ন করে বিচক্ষণভাবে বিচারকার্য সম্পাদনের যোগ্যতা হারাচ্ছে।

বিজ্ঞান আমদানিকৃত এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতোই ব্যবহার করা হয়। একই বিষয় সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের তথ্যসমূহ নিরাপদভাবে সঞ্চালন করা গেলেও সমাজ সংক্রান্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। ভিন্ন সংস্কৃতির জ্ঞান গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করা মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ জীবনে এবং সমাজের বাস্তবতায় এমন বিষয়সমূহকে আত্মস্থ করে নেওয়া যা স্বদেশের সমাজের মূলে প্রোথিত ছিল না। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটি জটিল। কারণ মুসলিম দেশগুলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কার্যকারিতা এবং প্রয়োগ অনুকরণ করে, সেই সাথে সামগ্রিক জ্ঞানের ভাণ্ডারও। মনোবিজ্ঞান ও সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার ফলাফলসমূহ এর সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত হলে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

গবেষণাকে নৈর্ব্যক্তিক ও সাংস্কৃতিক পক্ষপাতহীন হিসেবে গ্রহণ করা অপেক্ষা গবেষণার জন্য ব্যবহৃত ধারণা অথবা বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করা অধিক প্রাসঙ্গিক হবে। বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্তকারীরা আরবের সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতিকে পক্ষপাতপূর্ণ আখ্যায়িত করে সমালোচনার সম্মুখীন করে। সংস্কৃতি, আচার-আচরণ এবং নৈতিক নির্ভরতা জোরদার করার জন্য সামাজিকবিজ্ঞান একটি হাতিয়ার হতে পারে।

বিশেষত, তৃতীয় বিশ্বে আমেরিকান মডেল গ্রহণ করার ফলে আমেরিকান মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ ঘটছে। যেখানে গণমাধ্যমের প্রচারণা এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য ব্যর্থ হতে পারে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের প্রচার সফল হতে পারে। ফলাফল হচ্ছে একটি বিকৃত চিত্র, একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ– যাতে রয়েছে প্রতিযোগিতা, উদ্যোগ ও উৎপাদনশীলতার ঘাটতি।

মুহাম্মদ শাকরুনের মতানুযায়ী আরব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একটি 'সম্মিলিত' অস্তিত্ব, যেখানে আমদানিকৃত বিজ্ঞান আরবদের স্বতন্ত্র হিসেবে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য তাড়িত করে। অন্যদিকে একটি প্রগতিশীল প্রায়োগিক পদ্ধতি প্রতিটি সমাজকে তাদের নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি,

মূল্যবোধ এবং নৈতিক বিবেচনাসহ এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আরব সমাজ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। তাদের প্রয়োজন আমূল পরিবর্তনসহ একটি দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম। প্রাচ্যের বহু সমাজের বর্তমান সংঘর্ষ আদর্শগত নয়; বরং প্রতিদিনের চাহিদা, সীমানা-সংঘাত ও সমাজের স্থানীয় বিরোধের সাথে সংশ্লিষ্ট। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ভাবাদর্শিক সৃজনশীলতা থেকে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সাপেক্ষ।

যখন বহিরাগত উৎস থেকে বিজ্ঞান সঞ্চারণ করা হয়, আরব বিশ্ব শুধু নিষ্ক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোকে অনুকরণ করে, যেন তারা বিজ্ঞানের আবিষ্কারক অপেক্ষা আবিষ্কারকেই বেশি সম্মান প্রদর্শন করে। আরব বিশ্বে মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিগত হিসেবে বিবেচিত হয়। অথচ আমেরিকান মনোবিজ্ঞান– যার অনেকাংশই আমরা অনুকরণ করেছি, এ ধাপ অতিক্রম করে সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বারোপের মধ্য দিয়ে নতুন একটি ধাপের সূচনা করেছে। যৌক্তিকভাবে মনোবিজ্ঞান যে দেশ গ্রহণ করছে সেখানেই উন্নতি লাভ করা উচিত, কেননা নতুন সামাজিক পরিবেশের সাথে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারাবাহিক পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে এরূপ সংঘটিত হয় না। অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুনিষ্ঠতাকে অলঙ্ঘনীয় বলে আঁকড়ে ধরে থাকা এবং নিজস্ব আদর্শ বিচ্যুত হয়ে যাওয়া– এ দুই সমস্যার সম্মিলন আরব বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বে বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

আশার বিকল্প হচ্ছে একটি গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিবর্তনের আন্তরিক প্রচেষ্টা, যাকে একটি প্রগতিশীল মানসিক ক্রিয়া হিসেবে প্রত্যক্ষ করা হয় এবং গ্রহণযোগ্য ও উপযুক্ত সমাধানের দিকে ধাবিত করে। এটি অর্জন সম্ভব যখন আরব বিশ্ব বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক কৈশোর দশা এবং অহেতুক সাংস্কৃতিক উগ্রতা থেকে বের হয়ে তাদের নিজস্ব ধারণা ও পদ্ধতি গঠন করবে এবং তাদের নিজস্ব পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে পারবে তাত্ত্বিক পদ্ধতিকে পুনর্সংজ্ঞায়িত করার জন্য। এর মাধ্যমেই তারা তাদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক উত্থানকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এজন্য আরও প্রয়োজন একটি বিকল্প আদর্শ যা একটি বিকল্প সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র এবং একটি নতুন সাংস্কৃতিক মঞ্চের দিকে নিয়ে যায়। ■

পঞ্চম অধ্যায়

কারিকুলামে পক্ষপাত

হুদা হিগাজি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সঞ্চারণের প্রধান মাধ্যম বলে বিবেচনা করা হয়। এসব ইন্সটিটিউটসমূহ সীমাহীন তথ্য ও ধারণা থেকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বাছাই করবে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য একগুচ্ছ মূল্যবোধ নির্ধারণ করবে যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। এ বিষয়টি একটি পদ্ধতিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করে : বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিত সংখ্যক বিষয় বাছাই করা, অতঃপর বিভিন্ন ধাপের জন্য যথাযথ বিষয়সূচি তৈরি করা। কারিকুলাম সাধারণত গঠন করা হয় এবং নির্ধারণ করা হয় কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন– একটি সমাজের বিদ্যমান আদর্শ, শিক্ষাদর্শন, মূল্যবোধ এবং মানব প্রকৃতি। একটি কারিকুলামে সবসময়ই নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি বা বর্জনের প্রয়োজন হয়।

সুতরাং, বিদ্যালয়ের পুস্তকসমূহ 'নিরপেক্ষ' বা 'নৈর্ব্যক্তিক' নয় এবং নিজেদের সমাজের মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়। তাই, আমরা জ্ঞানতত্ত্বীয় প্যারাডাইম সংজ্ঞায়িত করবো– যার ওপর ভিত্তি করে কারিকুলাম গঠিত হবে। যখন একটি প্যারাডাইম বা প্রেক্ষাপট গ্রহণ করা হয়, তখন অন্যান্য প্যারাডাইমকে বাদ দেওয়ার জন্য যুক্তি উত্থাপন করা হয়। অপরদিকে, যখন আমরা তুলনা করি, তখন দুটির বিষয়সমূহ বা কাঠামো বিবেচনা না করে শুধু সামগ্রিক বিষয়ের তুলনা করি।

উদাহরণস্বরূপ, ম্যাক্স ওয়েবারের রচনায় *'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism'* ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেখানে তিনি পাশ্চাত্য যৌক্তিককরণের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন। ওয়েবারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ (Capitalism) সুনির্দিষ্টভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্যই। ওয়েবারের জন্য যথাযথ হতো পাশ্চাত্য পুঁজিবাদকে তার নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়নে ব্যবহার করা। কিন্তু

একটি ভিন্ন সংস্কৃতির অনুসন্ধানী উন্নয়ন ও প্রসারে পুঁজিবাদের ব্যবহার হবে ভ্রান্তপথে পরিচালনা।

ইসলামী সভ্যতা সংক্রান্ত গবেষণা উপনিবেশবাদী অথবা ঈর্ষাকাতর মিশনারিদের দ্বারা একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল যতক্ষণ না অধুনা মুসলিমগণ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞান সম্পর্কিত পক্ষপাতিত্ব নিয়ে সচেতন না হয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানীদের কিছু লেখা পাচ্ছি যারা ইসলামী সভ্যতাকে কেবল প্রাচীন ঐতিহ্যবাদী নিদর্শন হিসেবে স্বীকার করেছেন তা নয়; বরং দেখেছেন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে যা পরিবর্তনের সর্বজনীন নীতির প্রতি সংবেদনশীল। একটি সাধারণ ভাষা ও বিশ্লেষণধর্মী স্বয়ংসম্পূর্ণ রীতি প্রয়োজন, সকল কাঠামো ও ব্যবস্থার প্রতি বাহ্যিক হলেও যা প্রয়োগযোগ্য হবে সকল ক্ষেত্রে। ইসলামী সভ্যতার অধ্যয়নে পুঁজিবাদ অপেক্ষা যৌক্তিকতা আরোপ অধিকতর সাধারণ এবং উপযুক্ত টার্ম হতে পারে।

এ বিষয়ের একটি কোর্স প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করবে এবং উত্থাপিত প্রশ্ন হবে এরূপ : ইসলামী সমাজ কি এর বিশেষ পরিচয় না হারিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে পারবে? ইসলাম সমাজ পরিবর্তনের জন্য কীভাবে তার বিশাল জনগোষ্ঠীকে সমবেতভাবে গতিশীল করবে? এ রূপান্তর হবে কৃষিনির্ভর দুর্বল প্রযুক্তির সমাজ থেকে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণকারী সমাজ গঠনে। এভাবেই সম্পূর্ণ কাঠামো অভ্যন্তরীণ উদ্যোগের মাধ্যমে এর পবিত্রতা রক্ষা করে আমাদের এর রীতিনীতি অনুযায়ী পরিচালিত করতে পারে, যা আর ভুল বা দোষ-ত্রুটি সম্পন্ন বলে বিবেচিত হবে না। যখন মূল্যায়ন করা হবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকটবর্তিতা এখানে বিবেচনা করা হবে না। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, অতীত বা বর্তমান মানব অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতাকেই মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিতে হবে। ■

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রকৃতির উন্মোচন কুরআনসম্মত প্রেক্ষাপট

মাহমুদ দাউদি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence, AI) মানব বুদ্ধিমত্তার (Human Intelligence, HI) সমকক্ষ বা অপেক্ষাকৃত উত্তম হতে পারে কিনা, এ বিষয়ে মতানৈক্য চলছে। মানব বুদ্ধিমত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাঝের ব্যবধান বিবেচনাযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা মানুষের সংস্কৃতি ও কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, যার ওপর মানব বুদ্ধিমত্তার বিষয়সমূহ নির্ভর করে। মানুষের এ অনন্যতা সরাসরি সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত, কোনো বিবর্তনের ফল নয়। এই অনন্যতায় এরূপ রহস্য লুকায়িত যা ভেদ করা মানুষের দুঃসাধ্য। এ অবস্থায় গবেষকগণ কীভাবে নিজেদেরকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যন্ত্র তৈরিতে নিয়োজিত করতে পারেন?

গত দু'দশক ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণাক্ষেত্র তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পর্যায়ে অগ্রগতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে স্নায়ুবিজ্ঞানীগণ এবং অনেক সমাজবিজ্ঞানীও মানব বুদ্ধিমত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণা করেছেন। যেহেতু আধুনিক ও উত্তর আধুনিক সমাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অবকাঠামো সম্প্রসারিত হওয়া অব্যাহত রয়েছে, ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের গবেষণাকেও এখানে জড়িত হতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণা ব্যক্তিবিশেষকে বহু একঘেঁয়েমি কাজ থেকে স্বস্তি দেয়, অপরদিকে দ্রুত ও মানসম্পন্ন কাজ সেসব সমাজের বৈশিষ্ট্য যারা তথ্যপ্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করেছে।

এর প্রস্তাবক ও প্রতিপক্ষ সবার জন্যই মানব বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি প্রধান বা কেন্দ্রীয় হিসেবে বিবেচ্য এবং গবেষক অবশ্যই প্রশ্নের উত্থাপন করবে মানব বুদ্ধিমত্তা কেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষা উত্তম। মানব বুদ্ধিমত্তাতে এমন কী

আছে যার সীমাবদ্ধতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাতে রয়েছে। এরূপ প্রশ্নের উত্তরই আমাদেরকে মানব বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত বোধগম্যতা প্রদান করবে এবং আরও বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরিতে সহায়তা করবে।

কিছু গবেষক বিশ্বাস করেন জৈবরাসায়নিক যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানব বুদ্ধিমত্তার সমকক্ষ হবে। অন্যান্যরা মনে করেন, যন্ত্রের নকশা এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যা মানব মস্তিষ্কের মতো কাজ করবে। যন্ত্র চিন্তা করতে সক্ষম হবে এবং সচেতন বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হবে এরূপ ডিজিটাল কাঠামোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিকল্পনায় স্বজ্ঞা (Intuition), মন-মর্জি (Mood) ও আবেগ-অনুভূতির কোনো স্থান নেই; একটি যৌক্তিক চিন্তার যন্ত্রকে মানব অনুভূতি ও সংবেদনশীলতা থেকে বিরত রাখতে হবে।

সাংস্কৃতিক ঘটনাসমূহ মানব সম্প্রদায়কে অন্যান্য প্রজাতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যন্ত্র থেকে পৃথক রাখে। সাংস্কৃতিক বিদ্বানদের মাঝে একটি ঐকমত্য আছে যে, মানুষের প্রতীক ব্যবহার মানব সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। আচরণ বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্যারাডাইম অবশ্যই বিবেচনা করবে যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সাংস্কৃতিক প্রতীকধারী এবং এর সাংস্কৃতিক প্রতীক ব্যবহারের সামর্থ্য মানুষ এবং অন্যান্য প্রজাতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাঝে আমূল পার্থক্য বজায় রাখে। মানব বুদ্ধিমত্তাকে প্রকৃতভাবে বুঝার জন্য মানুষের সাংস্কৃতিক প্রতীকের ক্ষেত্রটি অবশ্যই গবেষণার অধীনে নিয়ে আসতে হবে।

চিন্তা-ভাবনা ও ধারণা তৈরিতে সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলোকে পরিচালনা করার ক্ষমতা ও জ্ঞান এবং শব্দার্থ সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞানার্জনের ভিত্তি। সাংস্কৃতিক প্রতীকের ওপর দৃঢ় জ্ঞানের আংশিক অনুপস্থিতিই মানব বুদ্ধিমত্তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাঝের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের হারানো যোগসূত্র। শিখন সংক্রান্ত যন্ত্রের দুর্বলতা ব্যাখ্যা করার জন্য এক্ষেত্রে গবেষকদের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে অনাগ্রহ একটি গুরুতর দুর্বলতা যা গবেষককে মানব বুদ্ধিমত্তার মৌলিকত্ব সম্পর্কে বুঝতে দ্বিধাগ্রস্ত করে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান গবেষণায় মানব বুদ্ধিমত্তাকে সামাজিকভাবে অবহেলিত করার নেতিবাচক দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বুদ্ধিমত্তা সাংস্কৃতিক প্রতীকের ওপর দৃঢ়ভাবে নির্ভরশীল যা মানুষের সামাজিকীকরণ সংগঠনের অনুমতি প্রদান করে। সংস্কৃতি, মন ও মানুষের চিন্তা-ভাবনা সংক্রান্ত সমসাময়িক গবেষণায়

দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় : আলোকিত বা সংস্কারপ্রাপ্ত যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কল্পনাপ্রবণ বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিতর্কের খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয়। অন্য একটি মতবাদ অনুযায়ী সংস্কৃতি, মন ও বুদ্ধিমত্তা প্রায়োগিক-অভিজ্ঞতাবাদ, দৃষ্টবাদ এবং যৌক্তিকতাবাদের পরিমাপক দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

মানব বুদ্ধিমত্তার তুলনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুর্বলতার কারণ হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধ যৌক্তিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লগারিদমিক কাঠামোগত নকশা যা আবেগধর্মী বা মৌলিক কল্পনাসমৃদ্ধ বিষয়সমূহের প্রতি নিস্পৃহ। সুতরাং, অভিজ্ঞতাবাদ, দৃষ্টবাদ, প্যারাডাইম কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, যেখানে এর দুটি মৌলিক উপাদান যুক্তি এবং বিচারবুদ্ধি? মানুষ কেবল যুক্তিতর্ক এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তার জন্য নয় বরং এর ঊর্ধ্বে। মানব বুদ্ধিমত্তার উৎকৃষ্টতার কারণ এর স্পর্শাতীত (Intangible) এবং মনঃকল্পিত (Subjective) বৈশিষ্ট্য। মানব বুদ্ধিমত্তা একটি জটিল বিষয়। সুতরাং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অথবা মানব বুদ্ধিমত্তা গবেষণা কখনও সংকীর্ণ ও অনমনীয় সূত্র বা কাঠামোবদ্ধ হতে পারে না।

মানব বুদ্ধিমত্তার গবেষণায় আল্লাহপ্রদত্ত বাণী বিবেচনা করা হয়নি, কেননা পাশ্চাত্যের রেনেসাঁর অভিজ্ঞতা মুসলিম বিশ্বকে এড়িয়ে যায় এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে সাধারণত বিরোধিতাপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি করে। একজন মুসলিম অবশ্যই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা মানব বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে যৌক্তিকভাবে কুরআনকে বিবেচনা করবে। এর মাধ্যমে মানব বুদ্ধিমত্তার অলৌকিক বা স্বজ্ঞালব্ধ প্রকৃতি, চিন্তা এবং মানব বুদ্ধিমত্তা ও সৃষ্টির কার্যক্রম সম্পর্কে আরও জ্ঞান উন্মোচন করতে সক্ষম হবে।

ধর্মীয় ও ইহজাগতিকতা মতবাদ অনুযায়ী একমাত্র মানুষই তার কর্মের জন্য নীতিগতভাবে দায়ী এবং মানব বুদ্ধিমত্তা মানুষকে দায়িত্ব ও কাজের স্বাধীনতা উভয়টিই প্রদান করে। বিজ্ঞানী ও বিদ্বানগণ যারা বিশ্বাস করেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনও মানব বুদ্ধিমত্তার সমপর্যায়ের বা মানব বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হতে পারবে না, তাদের জন্য কুরআন নিকটতম বন্ধু হিসেবে অবস্থান করছে। যেখানে কুরআনের প্রেক্ষাপট আমাদের সহায়তা করতে পারে, সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদ বা দৃষ্টবাদ পদ্ধতি এর বুদ্ধিমত্তার স্বজ্ঞালব্ধ প্রকৃতিকে অস্বীকার করার কারণে সহায়তা করতে পারছে না। ■

সপ্তম অধ্যায়

তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতিতে পক্ষপাতের মোকাবিলা করা

ফেরিয়াল জে. গাজুল

তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পদ্ধতিবিদ্যার ক্ষেত্রে পক্ষপাত হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান। অন্যদিকে সাহিত্য এরূপ বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্বপূর্ণ সংস্কার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। সাহিত্য তাত্ত্বিকভাবে পক্ষপাতগুলোকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ ও ঘোষণা করে এবং এরূপ ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে বিতাড়িত করে অবদান রাখতে পারে। সাহিত্য নির্ভর করে শৈলীনিষ্ঠতা ও শৈল্পিক কৌশলের ওপর, একে অপরের ওপর প্রযুক্তির প্রতিযোগিতার ওপর নয়। এখানে মৌখিক ও ধারণাগত উভয় ক্ষেত্রেই সমপ্রবেশাধিকার থাকে। অপরদিকে, অত্যাচারিত ও প্রান্তীয়রা শৈল্পিক দিক দিয়ে অত্যাচারী এবং শক্তিশালীদের অপেক্ষা সৃজনশীল হয়।

বদ্ধমূলভাবে প্রোথিত পক্ষপাতের বিরুদ্ধে সৃজনশীল প্রতিরোধ ভিন্নরূপে সংগঠিত হয়। এ অধ্যায়ে আফ্রিকা মহাদেশের তিনজন লেখককে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে : নাইজেরিয়ার চিনুয়া আচেবে, *'Things Fall Apart'*-এর লেখক; সুদানের তায়্যেব সালিহ, *'Season of Migration to the North'*-এর লেখক এবং মরক্কোর তাহের বেন জেলোন, *'I am an Arab, I am Suspect'*-এর লেখক।

আচেবের গ্রন্থটি তৃতীয় বিশ্বের একজন গর্বিত মানুষের গল্প যেখানে ওবি নৃগোষ্ঠীর মুখ্যচরিত্র ওকোনকৌয়ের করুণ পরিণতি প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে মূখ্যচরিত্র বিজয়ী ঔপনিবেশিকদের প্রচণ্ড আক্রমণ এবং তাদের মূল্যবোধের দাসত্ব গ্রহণের পূর্বে আত্মহনন করে। এ সাহিত্যটি বিশ্বাসযোগ্য, কেননা এখানে আফ্রিকান নায়ককে ইউরোপীয় দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করে একটি ভালো বনাম মন্দের নাটক সৃষ্টি করা হয়নি। বরং, এখানে বিজয় অর্জনকে এরূপ ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেখানে

পুরানো মূল্যবোধ ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে যায়। আচেবে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সৃজনশীল প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কৌশল প্রয়োগ করেন।

আচেবে আফ্রিকান ও ইউরোপীয় আদর্শের তুলনা করেন এবং উভয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি প্রমাণ করেন দুটি ধর্মের গোঁড়ামি বা যুক্তিহীন মতবাদ ভিন্ন হলেও ব্যবহারিকভাবে মর্মকথা একই। এ তুলনামূলক উপস্থাপন আমাদেরকে উৎকৃষ্টতার ক্রমানুসারে শ্রেণিবিন্যাস করা অথবা ধর্মস্বীকৃত বিশ্বাসব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে বাধা প্রদান করে। আচেবের কৌশল ভিন্ন সংস্কৃতির পাঠকদের আকর্ষণ করে এবং তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে ধাবিত করে। পক্ষপাতদুষ্টতা বা অধিকারহানি প্রকাশ করার জন্য রূপক ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে আচেবে সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন।

সালিহের উপন্যাস *'Season of Migration to the North'*-এ ঔপনিবেশিকতা ও নব্য-ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে বিরোধিতাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করা হয়। এখানে উত্তরের পক্ষপাতদুষ্ট বিচার এবং আফ্রিকানদের চরিত্রের ভুল উপস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচিত হয়েছে। উত্তরের বিভিন্ন ব্যঙ্গ-কৌতুক, সাহিত্য, নাটক প্রভৃতিতে আফ্রিকানদের একটি অযথার্থ চিত্র প্রদর্শিত হয়। শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডি *The Moor of Venice*-এর ওথেলো চরিত্রের পাল্টা আক্রমণ হিসেবে সালিহ আরবিতে তার উপন্যাস রচনা করেন। 'ওথেলো' হচ্ছে প্রথম নাটক যা আরব বিশ্বে অনুবাদ হয়ে মঞ্চায়িত হয়। শেক্সপিয়ারের রচনার মাধ্যমে আফ্রিকানদের যে চিত্র ইউরোপে প্রদর্শিত হয়েছে সালিহ চেয়েছিলেন তার সংশোধন ও বিরোধিতা যা তিনি করেছিলেন আরব ও ইসলামী বিশ্বে ওথেলোর চরিত্রটিকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে।

সালিহ ব্যাখ্যা করেন, ওথেলোর ক্রোধ বুঝা যায় যখন কেউ দেখে যে ওথেলো কখনও ভেনেসীয়দের সাদরে গ্রহণ করে নেয়নি বা ভেনেসীয়রাও তাকে কখনও পছন্দ করেনি। এটি এক ধরনের 'জাতিগত উন্মত্ততা, সাংস্কৃতিক বিরোধ'। একজন সুদানি শিক্ষার্থী যে ইংল্যান্ডে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সে তার অনুভূতি ব্যক্ত করে কীভাবে পশ্চিমা বিশ্ব তার সমাজকে ব্যঙ্গ করছে, অপব্যবহার করছে। সালিহ অত্যুক্তি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহযোগে একটি জটিল কৌশল প্রয়োগ করেন আফ্রিকা সম্পর্কিত পূর্ব-প্রস্তুতকৃত ধারণা পুনর্গঠনের জন্য। তিনি মুস্তাফা সাঈদকে একজন নকল নায়ক হিসেবে

উপস্থাপন করেন, যে অত্যাচারিত ও অত্যাচারী অথবা কর্তৃপক্ষ ও নির্ভরশীলদের মাঝের সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের ফলে সৃষ্ট। ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় এরূপ একটি সংকীর্ণ ও সংকর মানুষ যে ভিনদেশীয় নয় বা নিজ দেশ বা সংস্কৃতিরও নয়।

বেন জেলোনের মর্মস্পর্শী *'I am an Arab, I am Suspect'* গল্পে নৈমিত্তিক বক্রাঘাত (structural irony) ব্যবহার করা হয়, যেখানে মুখ্যচরিত্র অপেক্ষা পাঠক বেশি জানেন। এখানে তুলনা করা হয় অধস্তনদের সরলতার সাথে সংকীর্ণমনা সমাজের স্বার্থপরতার এবং বিশ্ব থেকে বিচ্যুতি। একজন আরব ততক্ষণ পর্যন্ত দোষী থাকে যতক্ষণ না পশ্চিমা বিশ্বের নিকট নিরপরাধ বলে প্রমাণ করতে না পারে। তার বিরুদ্ধে সর্বদা মিথ্যা দোষারোপ করে অপরাধী হিসেবে আচরণ করা হয়। সে বিস্ময়বোধ করে যখন তাকে মৌলবাদী হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে পাঠকদের নিকট এ ইঙ্গিতটা প্রদান করা হয় যে, আরব ব্যক্তিটি সম্পর্কে অন্যান্যদের ধারণা তাদের সাথে আরবের ব্যবহারের মধ্য থেকে প্রাপ্ত নয়; বরং তা পূর্বপ্রস্তুতকৃত দোষারোপ। নিরপরাধ শ্রমিক প্রশ্ন করে কেনো তাকেই সবসময় সন্দেহ করা হয় এবং পাঠক বিচলিত হয় এরূপ মিথ্যা দোষারোপসহ বিদ্যমান ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করার জন্য। বেন জেলোন কোনো উপসংহার বা হিতোপদেশ প্রদান করেননি, কিন্তু আচরণের দুটি রূপক পাশাপাশি স্থাপন করেছেন, বিচারের স্বাধীনতা পাঠকদের ওপর অর্পণ করে যেখানে তার কাহিনি বাস্তবতার করুণ পরিহাসকে নাটকীয় কৌশলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখতে পাই আফ্রিকান লেখকগণ প্রকাশ্যে সাহিত্যের মাধ্যমে তথ্য ফাঁস করে এবং প্রতিরোধের কৌশল সৃষ্টির মাধ্যমে পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্যের প্রতিরোধে অবদান রাখছে। তাদের এ প্রকাশশৈলীর মধ্যে রয়েছে যেগুলোকে ভিন্ন বলে বিবেচনা করা হয় সেগুলোর তুলনা করা, মহৎ রচনা বা শিল্পের পুনরায় ব্যাখ্যা করা, সুবিদিত বা সুপরিচিত রচনাসমূহের দুর্বল দিকসমূহ নির্দেশ করে তা জনসম্মুখে উন্মোচিত করা। ফলাফল হলো, ক্রমাধিকারতন্ত্রকে অস্বীকার করা এবং কর্তৃত্বময় ডিসকোর্সের কেন্দ্রের স্থানচ্যুতি। এভাবে, সৃজনশীল লেখক একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে কুসংস্কারের ভিত্তিকে বিনির্মাণ করেন। ■

অষ্টম অধ্যায়

পদ্ধতিবিদ্যার সীমা অতিক্রম পাশ্চাত্যের সাহিত্য সমালোচনায় পক্ষপাত

সাদ আবদুলরহমান আল-বাজি

পশ্চিমা সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতিগুলো তাদের উদ্ভূত সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গের পক্ষে পক্ষপাতপূর্ণ। যদি পশ্চিমা ভিন্ন অন্যদের সমালোচনা, যেমন– যারা আরব মুসলিম, যদি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সাহিত্যে এ পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে, তাদের দুটি পথের সম্মুখীন হতে হয় : ১. পদ্ধতিটি যেমন আছে ঠিক সেভাবেই প্রয়োগ করা, তাদের আদর্শ ও প্রায়োগিক ফলাফলকে গ্রহণ করে নেয়া, সাহিত্যের বিষয়বস্তুর মাঝে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা। অথবা, ২. পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন, যেখানে উদ্ভূত প্রায়োগিক পদ্ধতিটি নাটকীয়ভাবে প্রথমটি থেকে বিচ্যুত। পদ্ধতিবিদ্যাকে পরিবর্তনহীনভাবে বা সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে এর প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব– এরূপ দাবি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ভিত্তিহীন।

পশ্চিমা পক্ষপাতের প্রশ্নটি সরলভাবে প্রয়োগ করার পূর্বে তা পুনর্বিবেচনা করা উচিত এবং এর যথাযোগ্যতা যাচাই করা উচিত। কিছু সমালোচক ও বিদ্বানগণ এসব পদ্ধতিকে পক্ষপাতপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেন না বরং তাদের নিরপেক্ষ হাতিয়ার বলেই গণ্য করেন। সমসাময়িক আরব সমালোচকগণ কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতিটিকে নিরপেক্ষ উপকরণ বিবেচনা করে ব্যবহার করেছেন। তারা বিশ্বাস করেন এর মাধ্যমে আরব পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক পেক্ষাপটের বাধাসমূহ দূর হচ্ছে। জাতির ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার এবং অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হচ্ছে। এ পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির ন্যায় ঐতিহাসিক ও আদর্শগত শক্তিশালী শিকড় রয়েছে এবং এর সর্বজনীনতাকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়ার প্রবণতা পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক ধারায় বিকশিত হওয়ার সমপর্যায়ভুক্ত।

সাহিত্যকর্ম ও সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক কাঠামোতে বিকৃতির সমস্যা রয়ে গেছে। পদ্ধতিবিদ্যার অধ্যয়ন তার প্রকৃত প্রকাশের পূর্বে এর উৎসে সাংস্কৃতিক নির্দিষ্টতার পক্ষপাত প্রকাশ করে। তা সত্ত্বেও পদ্ধতির পক্ষপাতের কারণে পদ্ধতিটি সবসময় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এটি পারস্পরিক সুফল বা সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনাকে নাকচ করে না। পদ্ধতির পক্ষপাত বলতে বুঝায় একটি সংস্কৃতিতে সমজাতীয়তার উচ্চমাত্রা এবং তাকে অন্য সংস্কৃতিতে একই উদ্দেশ্যে বা গুরুত্বে ব্যবহারের দুঃসাধ্যতা। পাশ্চাত্য সমালোচনার বহিঃপ্রকাশ যা এখানে আলোচিত হয়েছে তা আরবীয় ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্গত উপাদানসমূহ নয়। বরং বহু পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ পশ্চিমা আন্তকেন্দ্রিকতাকে কাটিয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন।

দার্শনিক ইবন সিনা যুক্তির মাধ্যমে পদ্ধতির সমস্যাটি উপস্থাপন করেছেন। তার মতে যুক্তিবিজ্ঞান একটি সমন্বিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নির্ভর করে পদ্ধতিগত অথবা যৌক্তক ভিত্তির ওপর এবং কখনও কখনও অ্যারিস্টটলীয় (গ্রিস) দর্শনের ওপরও নির্ভর করে। যদি দর্শন পরিবর্তন হয়, এর সাথে গবেষণার পদ্ধতিগত ভিত্তির আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞানের সংকোচন ঘটে। দার্শনিক ইবন রুশদ ইসলামী সভ্যতায় গ্রিক দর্শনের একজন মুখ্য প্রবর্তক। কিন্তু অ্যারিস্টটলের কাব্যশাস্ত্রের সীমিত প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কিত ইবন রুশদের মূল্যায়ন প্রমাণ করে যে, সাংস্কৃতিক পার্থক্য সম্ভাব্য বৈষম্য সৃষ্টিতে সাধারণত স্পর্শকাতর।

অন্যান্য মুসলিম রক্ষণশীল বা পরিবর্তনবিরোধী বিদ্বানগণ সাংস্কৃতিক উন্মুক্তদ্বার নীতির আহ্বানে বাধা প্রদান করেন। আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউইয়ের মতে, যুক্তি প্রকৃতিগতভাবে একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক নীতির প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। পদ্ধতিবিদ্যাকে জ্ঞানীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা কোনোকিছুর সামগ্রিক বিন্যাস থেকে এর অভ্যন্তরস্থ উপাদানকে পৃথক করার শামিল। একইভাবে, মানুষের সাধারণ উদ্দেশ্যের উপস্থিতিতে তা অর্জনের উপায় ভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। নর্থরাপ ফ্রাইয়ের মতে, পদ্ধতি ও সমালোচনার উদ্দেশ্যের মাঝে সঙ্গতি বা মিল অর্জিত হবে তখনই যখন সমালোচনার মূলনীতি ও হাইপোথিসিস নির্ধারিত হয় সমালোচনার মধ্য থেকে সম্পন্নকৃত শিল্পকলা হতে। সাহিত্যকর্মের সমালোচনার জন্য প্রতিনিধিত্ব করে সাধারণ প্রতীক, ঐতিহ্য অথবা নমুনার ওপর ভিত্তি করা

একটি সুবিন্যস্ত সাংগঠনিক ঐক্য। ফ্রাইয়ের পদ্ধতিবিদ্যা অন্যান্য গঠনমূলক প্রবণতা থেকে ভিন্ন; কারণ এটি অধ্যয়নের দিক দিয়ে সমন্বিত এবং সাহিত্যকর্মসমূহের মাঝে প্রতীকী ও ধরনগত সংযোগ বিদ্যমান।

আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতি ইহলৌকিকতাবাদের প্রতি ধাবিত হচ্ছে কিন্তু তা দ্বারা এটি বুঝাচ্ছে না যে পাশ্চাত্য চিন্তা ও সংস্কৃতি থেকে ধর্ম দূরে সরে যাচ্ছে। রেনেসাঁ, যা সাধারণত ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধাচরণ করে তা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একটি ধর্মীয় সমালোচনামূলক আন্দোলনের সূচনা ঘটায়। এখানে বাইবেলের নতুন ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ধর্মকে রক্ষা করা হয়। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাইবেলের সাহিত্য এবং পৌরাণিক প্রকৃতিকে প্রাচ্য-কবিতা হিসেবে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ উন্নয়ন রোমান্টিসিজমের (কল্পনা ও আবেগধর্মী মানসিকতা ও সাহিত্য) উত্থানের সমপর্যায়ভুক্ত এবং নতুন ধর্মীয়/ইহবাদের সমালোচনার সম্মিলনকে স্পষ্ট করে, যা পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বাণীকে মানুষের পার্থিব সাহিত্যের সমমানের করেছে। ফ্রাই বাইবেলের অলীক বা পৌরাণিক প্রকৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করেও এর আদর্শরূপ হিসেবে অধিবিদ্যাগত ধারণাকে ধারণ করেছেন। দ্বৈত কথোপকথন ইহবাদকে গ্রহণ করেছে যা এরূপ সংস্কৃতির জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব। এ সংস্কৃতি এখন পর্যন্ত অধিবিদ্যাগত ও ধর্মীয় শিকড় ভাঙতে অপারগ যদিও নিটশে, ফ্রয়েড ও হেইডেগার শতাব্দী ধরে অধিবিদ্যাকে দূর করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

সার্বিকভাবে, পাশ্চাত্যে সমালোচনা পদ্ধতি একটি বিবেচনাযোগ্য মাত্রার সর্বজনীনতা মেনে চলে। তা সত্ত্বেও এখানে বিবেচনাযোগ্য মাত্রার সংস্কৃতি সুনির্দিষ্ট রয়েছে যা সঞ্চালনযোগ্য নয়। পরবর্তী বৈশিষ্ট্যের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিকতা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। ■

নবম অধ্যায়

ইসলামী সমাজের স্থাপত্যশৈলীতে নকশার তত্ত্ব ও মূলনীতি: সম্প্রদায় নির্মাণের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি

আবদেলহালিম আই. আবদেলহালিম

ইসলামী ও উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ সমাজে বিদ্যমান অনুন্নয়ন, বিচ্ছিন্নতা ও উদাসীনতা দূর করার জন্য প্রয়োজন উৎকর্ষতা ও সৌন্দর্যকে মূল্যবান বিবেচনা করা। উৎপাদনের উপায়কে পৃথক করার মাঝেই অনুন্নয়ন নিহিত, বিশেষত নির্মিত পরিবেশের মধ্যে যা সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত। এ পৃথকীকরণ সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক কৌশল রয়ে যায় যা সমাজের সংস্কৃতির সাথে দালানকোঠার নির্মাণের সংযোগ স্থাপন করে। এগুলো হচ্ছে জনগণের সৃজনশীল শক্তি, সম্প্রদায়ের সম্পদ ও দক্ষতা। আজকে অনেক সমাজে নির্মাণ কার্যক্রম আইন ও ব্যবস্থাপনার ন্যায় আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কোনো সম্প্রদায়ের পদ্ধতিসমূহের পুনর্বিকাশ বা পুনর্জাগরণের জন্য প্রয়োজন কিছু ঘটনার যেমন– সীমানা সংজ্ঞায়িতকরণ, কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং দালানকোঠাকে ওই নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত করা। যদি কোনো সম্প্রদায়ের পুনর্বিকাশ পদ্ধতি এ নির্মাণ কৌশল নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়, তবে গৃহনির্মাণ শিল্প মানুষের প্রাণশক্তি উজ্জীবিতকরণে এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের সৃজনশীল উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

গৃহনির্মাণ প্রক্রিয়া এবং সামাজিক জীবনের মাঝে একটি সংযোগ রয়েছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে গৃহনির্মাণকে এভাবে সমাজের পুনর্বিকাশে সহায়ক প্রক্রিয়া হিসেবেই ব্যাপকভাবে দেখা হয়। গৃহনির্মাণের যৌক্তিক প্রক্রিয়াকে সমাজের পুনর্বিকাশের সহায়ক বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এরূপ সমাজে বসবাস করে যেখানে ঐতিহ্য ও রীতিনীতি মানুষকে সংগঠিত রাখার একমাত্র উপায়। কোনো উন্নয়ন অবশ্যই স্থানীয়

সম্পদ ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। নতুন ভবন উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন সমাজের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখার একটি কৌশল। গৃহ বা ভবন সবসময়ই মানুষ ও তার সৃজনশীল সত্তার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত যা নৃতাত্ত্বিকভাবে মূল্যবান। এ মৌলিক পুনর্বিকাশ পদ্ধতি অনেক সমাজের প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠান ধারণ করে। এ পুনর্বিকাশে রয়েছে এরূপ অপরিহার্য চালিকাশক্তি যা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচিতি গঠন ও উন্নয়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। যদিও বর্তমানে কেউ কেউ অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও দক্ষতার নাম দিয়ে নির্মাণকে আনুষ্ঠানিকতা থেকে পৃথক করার যুক্তি প্রদান করেন। অন্তত উৎপাদন ও সংস্কৃতির মাঝে যথাযথ সামঞ্জস্যকরণ অবশ্যই প্রতীকী ধাপ পর্যন্ত থাকতে হবে।

সংস্কৃতি ও উৎপাদনের সামঞ্জস্যবিধান আবশ্যকীয় ও সম্ভব। নির্মাণ কৌশল অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সৃজনশীলতার সাথে সংযুক্ত করে এবং মূলধন ও জ্ঞান অর্জনে অবদান রাখতে সহায়তা করে। কোনো গোষ্ঠীর হৃদয়ে প্রোথিত গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট উক্ত গোষ্ঠীর সৃজনশীল ক্ষমতাকে পুনর্নির্মাণ করতে পারবে, বিশেষত যখন তা স্থানীয় কারিগর ও নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে স্থানীয় পরিবেশ-উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়। এটি পাথর খোদাই শিল্পীর জ্যামিতিক জ্ঞান ও দক্ষতার সাথে কারিগরের লিখিত নির্দেশনা ও চিত্রাঙ্কনের কাজের সামর্থ্যের সম্মিলন ঘটায়, যে সম্মিলন সৃজনশীলতার দিকে অগ্রসর করে। ■

দশম অধ্যায়

প্রযুক্তি ও উন্নয়নের প্রতিফলন
একটি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ

হামেদ ইবরাহিম এল-মৌসলি

আমাদের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক আগ্রহের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পক্ষপাতের সমস্যাটি। আধুনিকীকরণ (মডার্নাইজেশন), উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বেশকিছু টার্ম এখন পর্যন্ত পশ্চিমা, মুসলিম সরকার ও বিশ্বের প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সমভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব টার্মসমূহকে এদের অর্থের পরিবর্তন ব্যতীত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার সম্ভব নয়। আরব-মুসলিম ও তৃতীয় বিশ্বে পাশ্চাত্যের ধারণার ওপর ভিত্তি করে উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ধর্মের পরিবর্তে মুসলিমদের আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য প্রযুক্তির ওপর বিশ্বাসের কারণে এ টার্মসমূহ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুসলিমরা তাদের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং পেশা গঠনের ধারাবাহিকতায় পাশ্চাত্যের পরিবর্তনের হাওয়া দ্বারা বিভিন্ন মাত্রায় আক্রান্ত হয়েছে। চারপাশের বিশ্ব পরিবর্তনের পূর্বে মুসলিমদের প্রথমেই নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে। তাদের পুনঃনিরীক্ষা করতে হবে সকল স্বতঃসিদ্ধ (Axioms) বিচারের মানদণ্ড (Criterion) ও মূল্যবোধ; যা সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ব্যবহারিক সকল কার্যক্রমকে চালিত করেছে এবং পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক পক্ষপাতের বিষয় হয়েছে।

পক্ষপাতের বিষয়টি সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সময়ের আবর্তনে মুসলিমরা ক্রমশ পশ্চিমাদের দাসভাবাপন্ন হতে থাকে এবং স্বাধীন সংস্কৃতি চর্চার উদ্যোগে বাধার সম্মুখীন হয়। কোনো ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর জন্য তার নিজস্ব প্রকৃত সংস্কৃতিকে বর্জন করে ভিনদেশীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা বেশ দুঃসাধ্য। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন বিদেশি সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের দীর্ঘ সময়ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন

কার্যক্রম। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সাথে সাথে একটি প্রভাবশালী সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতিকে গৌণ বা অপ্রধান করছে তার সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে। এ পদ্ধতি অখণ্ডতাকে ধ্বংস করে এবং পরাজিত সংস্কৃতির অপরিহার্য সৃজনশীল যোগ্যতাকে ধ্বংস করে কাঠামোর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য 'কৌশল' (Technique) ও 'প্রযুক্তি' (Technology)– এই দু'টি টার্মের ব্যবহার যা ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আমদানিকৃত বা সঞ্চালিত সেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে : কৌশল উৎপাদন কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেখানে প্রযুক্তি সংগঠিত হয় মানসিকভাবে এবং শারীরিক বাস্তবতায় উৎপাদন অপেক্ষা অধিক উচ্চ পর্যায়ে এর অবস্থান। যেমন– কিছু কিছু প্রজেক্ট সরাসরি পূর্ব-প্রস্তুতকৃত অবস্থাতেই আমাদের কাছে পৌঁছানো হয়, একইভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবহারের জন্য কিছু ধারণা প্রচার করা হয়। 'প্রযুক্তি স্থানান্তর' (Technology Transfer) দু'টি দলের মাঝে একটি একপাক্ষিক সঞ্চালনের ন্যায়, এবং প্রযুক্তিকে একটি 'বস্তু' হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেনো এটি একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে অন্য একটিতে স্থানান্তর সম্ভব, যা প্রকৃত অর্থে সম্ভব নয়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রমাণ করে যে প্রযুক্তি স্থানান্তরযোগ্য নয়। প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের উপাদানসমূহ স্থানান্তর করা সম্ভব শুধু অর্জন করা এবং কার্যকর পর্যায়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আরব-ইসলামী বিশ্ব কর্তৃক মহৎ উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা হবে এর নিজস্ব প্রযুক্তিগত সামর্থ্য গঠনের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত অভিযোজন বা নতুনত্ব প্রবর্তনের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না, যা প্রযুক্তিগত স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তস্বরূপ। শিল্পোন্নত পশ্চিমা সমাজ অথবা জাপান থেকে কৌশল গ্রহণের ওপর ভিত্তি করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন পরিকল্পনা গঠন ও প্রয়োগের মনোভাব সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর প্রভাব ফেলছে এবং একটি নাস্তিবাদী মনোভাব সৃষ্টি করছে, যা পশ্চিমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করছে। এ দ্বন্দ্ব আমাদের কাছে অধিক ইতিবাচক হিসেবে গৃহীত হতে পারে যদি আমরা প্রশ্ন করি : কীভাবে আমরা প্রযুক্তিকে আমাদের সাংস্কৃতিক কাঠামোর একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে এবং সম্ভাব্য সুপ্তশক্তি হিসেবে অঙ্গীভূত করতে পারি? আরব-মুসলিম সমাজে পশ্চিমা উন্নয়ন মডেলের গ্রহণ ভারসাম্যহীন বিনিময় সম্পর্কের সৃষ্টি করে যা এর সদস্যদের পাশ্চাত্য পণ্য, কৌশল, প্রযুক্তি ও সেবার ভোক্তায় পরিণত করে।

মানুষের আত্মোন্নয়ন, সচেতনতা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন সংগঠিত হয় না। সংস্কৃতির অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। পাশ্চাত্য মডেল সংস্কৃতিকে এ কার্যক্রম থেকে বিরত রাখে, যা সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচিতি হারানোর দিকে ধাবিত করে। আধুনিকায়ন আত্মোপলব্ধি নিয়ে গঠিত যা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জন্য অত্যাবশ্যক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। আরব-মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজন শিক্ষায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যেখানে বর্তমান পদ্ধতি নির্লিপ্ততার কারণ হয়। আরব-মুসলিম সংস্কৃতিতে, পৃথিবীতেই স্বর্গলাভ এবং পার্থিব উন্নয়নের স্বপ্ন কখনও প্রকৃত বা খাঁটি ছিল না, যেহেতু সংস্কৃতি মানুষকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে স্থাপন করে না বা পার্থিব জীবনকে অন্তহীন জীবন থেকেও পৃথক বলে গণ্য করে না। ■

একাদশ অধ্যায়

ভৌতবিজ্ঞান আইন প্রণয়নের অন্তর্নিহিত দার্শনিক বিশ্বাস

মাহজুব তাহা

ভৌতবিজ্ঞানের নীতি ও তত্ত্ব সংক্রান্ত মতামত একটি অনন্য উৎপাদন (product) যাতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গিটি যে প্রতিজ্ঞার ওপর নির্ভর করে তা হচ্ছে সব ধরনের বৈজ্ঞানিক বিতর্ক গবেষণাগারে সমাধান করা সম্ভব এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাই সর্বশেষ সমস্যা সমাধানকারী। যাই হোক, এটি শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং পর্যবেক্ষণ একটি সূচনামাত্র। মানুষ সংক্রান্ত তত্ত্বগঠন অত্যাবশ্যকীয়; যা বৈজ্ঞানিক কর্মের প্রকৃত চালিকাশক্তির উপস্থাপন করে। মানুষের মন যখন সত্যকে প্রতিটি কোণ থেকে দেখে বুঝার চেষ্টা করে তখনই বিজ্ঞানের উত্থান হয়। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর নির্ভরশীল পদ্ধতি শতাব্দী ধরে বিকাশ লাভ করেছে। শুধু প্রযুক্তিগত সাফল্যের কারণে এ পদ্ধতি অগ্রসর হয়েছে তা নয়; বরং বৈজ্ঞানিক চিন্তন-প্রক্রিয়া ও তাত্ত্বিকীকরণেরও প্রভাব রয়েছে। এ অগ্রগতি আমাদেরকে একটি পদ্ধতিবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে যা পরীক্ষানির্ভর পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ সূত্র গঠনের দিকে চালিত করে। সারসংক্ষেপ তিনটি ভিন্ন ধাপে হয়ে থাকে: সংরক্ষণ আইনস্তর, পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ থেকে সরাসরি অনুমান। সাধারণ নিয়মের ধাপটি স্বতঃসিদ্ধ, যা পরিচিত সংরক্ষণ নীতির যথার্থতা নিশ্চিত করে এবং সমন্বিত তত্ত্বের ধাপ যা একটি একীভূত গাণিতিক সূত্র প্রদান করে মৌলিক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার জন্য। মানবচিন্তা পরীক্ষামূলক তথ্যের সাধারণীকরণের একটি প্রধান কারণ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণার ভিত্তি হচ্ছে, কার্য-কারণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, এরূপ যৌক্তিক বিশ্বে আমদের বসবাস। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি অপরিহার্য উপাদান কার্যকারণের

পারস্পরিক সম্পর্ক। কিন্তু সিদ্ধান্তকরণের স্বতঃসিদ্ধ সংশোধন করা হয় পরীক্ষণের ফলাফলের সাথে যথোপযুক্ত করার জন্য। প্রাকৃতিক বিশ্ব একটি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে, যদিও সম্পূর্ণ বোধযোগ্য যুক্তি দ্বারা এরূপ দৃষ্টিকোণকে সমর্থন করা অসম্ভব। কখনও কখনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরীক্ষণের ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দার্শনিক ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যাত হয়। ভিত্তিগত কার্যক্রমের একটি পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সকল ক্ষেত্রে দার্শনিক মৌলিক প্রতিজ্ঞার সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত নয়। এ সম্পর্কটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এটি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের গবেষণায় বুদ্ধিগত ও সাংস্কৃতিক একটি মাত্রা প্রমাণ করে। এটি প্রযুক্তিগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং মানুষের চিন্তার কল্পলোকে অবদান রাখতে পারে। অনেক মৌলিক বৈজ্ঞানিক নীতির বিবৃতি কিছু দার্শনিক দৃষ্টিকোণকে পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ বিবেচনা করে সুদূরপ্রসারী সাধারণীকরণ করে। এরূপ ঘটনা পরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের সীমা অতিক্রম করে।

একজন গবেষক যিনি সর্বজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস করেন তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং আরও বিশ্বাস করেন দৃঢ়সংকল্পকরণ দুর্বোধ্যতার একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছে সমাপ্ত হয়। ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক অবস্থান অনুযায়ী আকস্মিক বা দৈবাৎ ঘটনা সৃষ্টিকর্তার নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৈবাৎ ঘটনার ধারণা কার্যকারণ সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। একজন বিশ্বাসী গবেষক সমষ্টিগত ও ব্যক্তিক ব্যবহারের মাঝের বৈষম্য ব্যাখ্যা করতে পারে। যেখানে অন্যরা এ ধারায় চিন্তা পরিত্যাগ করবে মানুষের মানসিকতার অনন্যতা এবং বিশ্বের অন্যান্য প্রাণি অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসের কারণে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে প্রয়োগকৃত সকল উদ্যম মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য পাওয়ার প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে তার আদর্শ, বুদ্ধিমত্তা ও দার্শনিক অবস্থান প্রতিফলিত হয়। বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ পাঠের ক্ষেত্রে এটি আমাদের লক্ষ রাখা উচিত। ■

গ্রন্থ পরিচিতি

আবদেলওহাব এম এলমেসিরি সম্পাদিত *Epistemological Bias in the Physical and Social Sciences* মূলত পক্ষপাত বিষয়ক একটি সংকলন, যা আইআইআইটি কর্তৃক আরবিতে প্রকাশিত গ্রন্থের ইংরেজি রূপ। আইআইআইটি'র সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-সিরিজ প্রকল্পের আওতায় এ সংকলনটিকে সংক্ষিপ্ত, সহজ ও সুখপাঠ্য করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এলিসন লেক।

এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এমন একটি প্রসঙ্গ নিয়ে অনুসন্ধান ও সমালোচনা করা হয়েছে, যা পাশ্চাত্য দর্শন হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম অ্যাকাডেমিক জ্ঞানজগতে অপরিহার্য, সুসংজ্ঞায়িত এবং ব্যাপকভাবে গৃহীত। এটি হচ্ছে ইতিবাচকতা বা প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) আধিপত্য এবং মুসলিম সমাজ-অর্থনীতি-ধর্মীয় বাস্তবতার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ গবেষণা ধারা, পদ্ধতি, নমুনা, পারিভাষিক শব্দাবলি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করে নেওয়া বা সংস্কৃতির সাথে প্রায় একীভূত করা।

এ গ্রন্থে জ্ঞানের প্রচলিত উৎস, পারিভাষিক শব্দাবলি, পদ্ধতিসমূহ, গবেষণা উপকরণ ও ধারণাগত মূলনীতিসমূহের মাঝে বিদ্যমান সুপ্ত পক্ষপাতগুলো খুঁজে বের করা হয়েছে এবং পক্ষপাতগুলোর নিরপেক্ষ বিকল্প উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি পশ্চিমা সৃজনশীল অবদানের মানবিক মূল্যবোধকে খাটো করে দেখা নয়, বরং একেই একমাত্র অবলম্বন মনে করে সর্বদা 'আঁকড়ে ধরে' থাকার চেষ্টার ভয়াবহতা তুলে ধরা।

লেখক পরিচিতি

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের দামানহুর সিটিতে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৯ সালে তিনি মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক, ১৯৬৪ সালে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর এবং একই বিষয়ে ১৯৬৯ সালে Rutgers University (The State University of Newjersey) থেকে পিএইচডি করেন। ড. আবদেলওয়াহাব এম. এলমেসিরি কায়রোর আইন শামস ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ও আমেরিকান সাহিত্যের ইমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আল আহরাম সেন্টার ফর পলিটিক্যাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে ইহুদিবাদের বিশেষজ্ঞ, জাতিসংঘে আরব লীগের অফিসে সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা এবং রিয়াদের কিং সৌদ ইউনিভার্সিটি ও কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি জিওনিজম, মর্ডানিজম, পোস্টমর্ডানিজম, সেক্যুলারিজম এবং ম্যাটেরিয়ালিস্ট ফিলোসফি প্রভৃতি বিষয়ে আরবি ভাষায় ৬০টি গ্রন্থ ও বহু গবেষণা নিবন্ধ লিখেছেন। তার সর্বাধিক জনপ্রিয় কর্ম যাকে বিশ শতকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আরবি এনসাইক্লোপেডিয়া বিবেচনা করা হয় তা হচ্ছে: ৮টি ভলিউম এর দ্য এনসাইক্লোপেডিয়া অব জিউস, জুডিইজম এন্ড জায়নিজম (১৯৯৯)। এছাড়া তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে- দ্য ল্যান্ড অব প্রমিস (১৯৭৭); দ্য প্যালেস্টাইনিয়ান ওয়েডিং (১৯৮২); দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব জায়নিস্ট কনসেপ্টস অ্যান্ড টার্মিনোলজি (১৯৭৫); জায়নিজম, নাজিজম এন্ড দ্য ইন্ড অব হিস্ট্রি (১৯৯৬); কম্প্রিহেনসিভ এন্ড পার্শল সেক্যুলারিজম, ২ খন্ড, (২০০২); এবং ইন ডিফেন্স অফ ম্যান (২০০৪)। ড. এলমেসিরি'র মৃত্যুবরণ করেন ২০০৮ খ্রি.।

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ISBN: 978-984-96731-8-7